নেহ্রু ও ধর্মনিরপেক্ষতা

ইন্দ্র কুমার রায়

জওহরলাল নেহ্রুর কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যয়ই ছিল না, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর রাষ্ট্রীয় নীতিও ছিল ।

নেহ্রু স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন , সবক্ষেত্রে পুরাকালে রচিত শাস্ত্রের কতগুলো অযৌক্তিক বদ্ধমূল ধারণার সনাতন সত্যতায় বিশ্বাস করতেন না ।(1) ভারতে ও সমগ্র পৃথিবীতে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত । বিরাট একটি উৎপাদন তন্ত্র শুধু কতিপয়ের লোভ ও লাভের উদ্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে আর সর্বসাধারণ কেবল সুষ্ঠু জীবনধারণের প্রয়োজনে তার সামান্য অংশও পাচ্ছেনা, ক্ষুধা ও অস্বস্থ্যে ভুগছে, এই অর্থনৈতিক অব্যবস্থার প্রতিকারই প্রধান কর্তব্য বলে তাঁর মনে হয়েছে ।(2) দারিদ্র ও ব্যাধি পূর্বজন্মের কর্মফল -- ধর্মের এই ব্যাখ্যা তাঁর কাছে একান্তই অগ্রাহ্য ছিল । ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, আমি অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করছি -- আমি সমাজবাদী ও প্রজাতন্ত্রী , আমি রাজতন্ত্র বা আজকাল যে তন্ত্রে এমন সব শিল্পপতি তৈরি হচ্ছেন যাঁদের পরশ্রমে নিজেদের মেদপুষ্টির স্পৃহা ও ক্ষমতা আগের কালের অত্যাচারি রাজাদের চেয়েও বেশি, সেই তন্ত্রে আমি বিশ্বাসী নই ।

তাই বলে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত ঘোর অবিশ্বাসীর মত ছিলনা মোটেও । তিনি তাঁর Discovery of India বইতে বলেছেন : ধর্ম অবশ্যই মানবমনের কোনো গূঢ় ও গভীর অভাববোধ পূরণ করে , বিজ্ঞান প্রকৃতির যত রহস্যই উন্মোচন করুক না কেন, আরও কিছু নিগূঢ়তর রহস্য থেকে যায় যা বিজ্ঞানেরও আওতার বাইরে ।(3)

কিন্তু নেহ্রু সর্বদাই ধর্মসংগঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন । এই সংগঠনগুলো শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয় , সমাজের বৃহত্তর অংশের দুঃখদুর্দশাকে ঈশ্বরের বিধান বলে প্রচার করে অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের পরিপোষকতা করে । সুতরাং ধর্মের যদি কোনো কাজ থাকে তবে তা শুধু ব্যক্তির নৈতিক ও আত্মিক উন্নতিসাধন, কিন্তু সংগঠিত আকারে সমাজের পরিবর্তন এবং সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার সহায়ক নয় ।(4)

ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করলে তার থেকে কতগুলো সিদ্ধান্ত আসে । প্রথমত, রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ ধর্মের পরিপোষকতা করবে না । দ্বিতীয়ত, যে কেউ তার স্বীয় ধর্মীয় আচরণে কোনো বাধা পাবে না, সে-ও অপরের ধর্মীয় আচরণে কোনো বাধা দেবে না । তৃতীয়ত, সব ধর্মের লোকই নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার পাবে । মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করত, তাই সেই সময়ের ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল একথা নিশ্চই বলা চলে না । এখনও দেখা যায়, কোনো কোনো রাষ্ট্র একটি বিশেষ ধর্মীয় নাম গ্রহণ করে । তার ফলশ্রুতি দাঁড়ায় , ঐ ধর্মের প্রাচীন শাস্ত্রের বিধিনির্দেশগুলি ঐ রাষ্ট্রের আইন হয়ে দাঁড়ায় ; তার ফলে সেই রাষ্ট্রের অপর ধর্মাবলম্বী লোকেরা নাগরিকত্বের সমান সুযোগ সুবিধা পায় না । ফলে, ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অসাম্য আসে ।

সমাজবাদের ভিত্তি সাম্য, ধর্মীয় রাষ্ট্র সাম্যবিরোধী । নেহ্রু সমাজবাদী , তাই তিনি ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠ । একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করলেই মধ্যযুগের ধর্মীয় বিরোধের হিংস্রতার পুনরাবৃত্তি নিবারণ করা যেতে পারে -- নেহ্রু এ বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন ।

১৯৩৩ সালেই তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই অগ্নিবর্ষী ভাষায় সোচ্চার হয়েছিলেন, বলেছিলেন, স্বাধীনতার সংগ্রামকে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ; আরো বলেছিলেন , হরিজন উন্নয়ন ইত্যাদি গৌণ কাজগুলো বৃদ্ধা মহিলাদের হাতে ছেড়ে দিলেও চলতে পারে ।(6)

রাজনীতির কূট-কৌশলে এবং ঘটনাচক্রে যখন ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতভাগ অনিবার্য হয়ে উঠল, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট লাহোর ও অমৃতসরে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠল, এবং তার প্রতিক্রিয়া দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল, তখন একা নেহরু সকল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা তুলে ধরে রাখলেন, রাস্তায় নেমে নিষ্ক্রিয় দন্ডায়মান ভারতীয় সৈনিককে কিভাবে সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতকারীর দিকে বন্দুক ছুঁড়তে হয় তা শেখাতে গেলেন । তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লিখলেন, লাহোরে যা হচ্ছে এবং হয়েছে তার প্রতিক্রিয়ায় যদি আমরা অনুরূপ আচরণ করি তাহলে অন্যেরা যা-ই ভাবুক না কেন, এমন নেতাগিরি আমার জন্য নয় । বাপুর কাছে আমরা কী শিখলাম ? জগৎ আমাদের কীভাবে দেখবে ? সব চেয়ে বড় কথা, আমাদের নিজেদেরই স্বকীয় আদর্শে দৃঢ় থাকতে হবে নাহলে আমরা নিজেদের বিচারেই দোষী হয়ে থাকবো ।(6) নেহরুর কঠোর সমালোচক D.F.Karaka পর্যন্ত লিখলেন, ভারতবিভাগের পরমুহূর্তের সংকটকালে নেহরু একক হস্তে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে দৃঢ় ছিলেন -- শুধু উদ্দেশ্যের সততা দ্বারা, যে সততা তাঁর এক সহজাত সংস্কারের মত ছিল ।(7)

এই প্রসঙ্গে নেহরু-চরিত্রের একটি আকর্ষণীয় দিক তুলে ধরা যায় ; ১৯৪৬ সালে Jaiques Marcuse-কে নেহরু জোরের সঙ্গে বলেছিলেন -- দেখবে, ভারত ডোমিনিয়ন হবে না, পাকিস্তান হবে না, সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না । স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালেই J. Marcuse-এর সঙ্গে দিল্লীতে নেহরুর আবার দেখা হয় । Marcues লিখেছেন, 'নেহরুকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী তিনটি মনে করিয়ে দিতে মন চাইছিল না । কিন্তু নেহরু সুন্দর হেসে আমাকে বললেন, আমি কি বলেছিলাম -- ডোমিনিয়ন নয়, পাকিস্তান নয়, . . . ,নেহরু থামলেন । শেষে বললেন, আমি কি ভুল করিনি ? মহত্বের চেয়েও বড় একটা কিছুর স্পর্শ পেলাম ।'(8)

১৯৪৯ সালে নেহরু মেহের চাঁদ খান্নাকে লিখেছিলেন, ভারতে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বাড়তে থাকলে বুঝব, আমি যা কর্তব্য মনে করি তা করতে পারছি না, এবং তা হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বে থাকবো না ।(9) ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পূর্ববঙ্গের শরণার্থী আগমনের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলে, এবং তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুরা ভীত হয়ে পড়লে, বৃটিশ কূট কৌশলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ নেহরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ'কে আমন্ত্রণ জানালেন দুই প্রধানমন্ত্রী মিলে দুই বাংলায় ঘুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে, সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ রোধ করতে ।(10) সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেলকে লিখলেন -- 'আমার মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে লিয়াকত আলির সঙ্গেই হোক বা একাই হোক , আমি দুই বাংলা ঘুরব এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব । এটা যদি নিয়তির বিধানই হয়, এবং একে অতিক্রম করার শক্তি আমার যদি না-ও থাকে, তবু আমার একটা কিছু করা দরকার । বাপু বাংলার জন্য যা করেছেন, সে কথা মনে করলে আমি অস্থির হয়ে পড়ি । প্রধানমন্ত্রীর গদি আমার কাছে কন্টকাকীর্ণ মনে হয় ।' লিয়াকত আলি যুগ্মভাবে বঙ্গভ্রমণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, নেহরুর পদত্যাগের পরিকল্পনায় আপাতত ইতি পড়ল ।(11)

তার পরেও মার্চ মাসে তিনি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তার পদত্যাগের ইচ্ছা জানান -- প্রধানমন্ত্রী থেকে তিনি তাঁর ইপ্সিত পন্থায় কাজ করতে পারছেন না ।

শেষ পর্যন্ত নেহরুর পদত্যাগের পরিকল্পনা কার্যকরী হল না, জল অনেক ঘোলা হল, অনেক ঘটনা ঘটল । ৮-ই এপ্রিল লিয়াকত আলির সঙ্গে একটা চুক্তি হল, দুই সরকারই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকত্বের সব অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন । তবে এই সাময়িক শান্তিও বেশিদিন টিকল না । তবুও এই প্রসঙ্গে নেহরু এপ্রিল মাসে, এবং পরে আবার ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের লিখেছিলেন -- এ ব্যাপারে আমার মন পরিষ্কার । আমার প্রধানমন্ত্রীত্বে আমি কখনও সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রনীতির ওপর হস্তক্ষেপ করতে দেব না, কারণ ঐ মনোভাব বর্বরতা ও অসভ্যতার সামিল । ভারতের মত বিরাট দেশে সব ধর্মের লোকেদের মধ্যেই , বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের মধ্যে, সমনাগরিকত্বের অধিকারবোধ জাগ্রত করা দরকার ।(12)

এটা ঠিক যে ভারতে ধর্মীয় বিরোধ আজও মিটে যায়নি, তবুও স্বীকার করতে হবে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েও নেহরুর পরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের রাষ্ট্রনীতির একটি স্তম্ভ । এবং তাঁর জীবনাবসানের চার দশক পরেও এই স্তম্ভ এখনও দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান ।

তথ্য সূত্র :

(1) J.L.Nehru, *An Autobiography* , p377
(2) S.Gopal, *Jawaharlal Nehru, A Biography* , Vol I, p68
(3) Nehru, *Discovery Of India*, pp 26, 31, 544, 593
(4) Nehru, *An Autobiography*, p374
(5) Gopal, op. cit., I, p182
(6) Nehru's letter to Rajendraprasad, 19 Sept. 1947 ; A. Campbell-Johnson's diary entry, 13 Sept. 1947 ; *Mission with Mountbatten*, p189, quoted in Gopal, op. cit., p 16
(7) D.F.Karaka, Nehru, the Lotus-eater From Kashmir, p104, quoted in Michael Brecher, *Nehru - A Political Biography*, p366
(8) Article by Jacques Marcuse in Richard Hughes, *Foreign Devil*, p289, quoted in Gopal, op. cit., II, p14
(9) Nehru's letter to Meher Chand Khanna, 6 June 1949, quoted in Gopal, op. cit., II, p82
(10) Gopal, op. cit., p83
(11) Ibid, p84
(12) Ibid, p87